আমার জগৎ, না জগতে আমি ঃ একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়
দর্শনবিভাগ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি

বিগত এক বছরের বেশি সময় যাবৎ বিশ্ব এক অতিমারীর প্রকোপে বিধ্বস্ত, বিপন্ন। মানুষ আজ এমন এক অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যার জন্য কোনভাবেই সে প্রস্তুত ছিল না। করোনা নামক অতিমারীর কারণে আমাদের স্বাভাবিক জীবন তার নিজস্ব ছন্দ হারিয়েছে। এই বিপন্নতার কারণে আমরা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত, সংশয়ান্বিত, ভীত-সন্ত্রস্ত। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে এত সহজে এ বিশ্ব করোনামুক্ত হবে না। তবে কী জীবন এমনই বিপন্ন হয়ে থাকবে? এই মৃত্যু মিছিলই কী সভ্যতার পরিণতি? জগতের ধ্বংস কি অনিবার্য? এমন হতাশাজনক প্রশ্নই আমাদের মনকে পীড়িত করে চলেছে অহরহ। বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মানব অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে একথা সত্য হলেও মানবসভ্যতার এমন পরিণতি স্বীকার করে নিলে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, উন্নত বলে দাবী করার অহমিকা অর্থহীন। সে কারণেই এই নতুন পরিস্থিতিতেও কিভাবে অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করা যায়, সভ্যতার অগ্রগতিতে নিশ্চিত করা যায় সেই পথের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভালো থাকার জন্য নিজেদের নতুন করে প্রস্তুত করতে হবে; পরিবর্তন প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর, জীবনদর্শনের। এই প্রস্তুতি পর্বের প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে আমাদের ত্রুটিগুলোকে— যা আমাদের ভালো জীবনের পরিপন্থী। ত্রুটিগুলি নির্ণয় করতে সমর্থ হলে সেগুলি সংশোধন করে এক নতুন বিশ্ব গড়ার কারিগর হয়ে উঠবো আমরা। আর এই দায়িত্ব কিন্তু নিতে হবে দার্শনিকদেরই— যাঁরা পথ প্রদর্শক হবেন, মানুষকে নতুন আঙ্গিকে ভাবতে সাহায্য করবেন।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের প্রধান সমস্যা হলো জগতের প্রতি আমাদের মনোভাব। জগতকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অখণ্ড একক বলে না বুঝে আমরা তাকে খণ্ড-খণ্ড পরস্পরবিরোধী বস্তুর সমাহার বলে দেখতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এমন প্রচেষ্টা কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের ফল। এই পদ্ধতি বিষয়কে খণ্ডে বিভক্ত করে তার বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা প্রদান করে। এর ফলে আমরা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলির অনুসন্ধান করি এবং তাদের পরস্পর বিরোধী বলে নির্ধারণ করি। আমাদের যুক্তিবাদী মনের এই খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণে যে প্রয়াস তা কিন্তু কেবলমাত্র জড়বস্তু বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকে না; মানবমন, এমনকী মানব সম্পর্ককেও আমরা একই ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। ফলের সামগ্রিকতার দৃষ্টি বা holistic view অনুসারে বিষয়কে বুঝতে আমরা চেষ্টাই করি না। জাগতিক বিষয়গুলোর মধ্যে আপাত পার্থক্যের অন্তরালে যে মূলসূত্র, যে একরূপতা বর্তমান তাকে উপেক্ষা করি। প্রত্যক্ষ নির্ভর অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কারণে এই পার্থক্যের অতিরিক্ত আর কিছু উপলব্ধি করতে আমাদের সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক মন ব্যর্থ হয়। ফলে নিজেকে এক ক্ষুদ্র, সীমিত পরিসরে

সীমায়িত করে নিজের নিজের স্বতন্ত্র জগতে বাস করি আমরা। আমরা যে এই জগতেরই অংশ— আমাদের অস্তিত্ব যে জগতের প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজের উপরই নির্ভর করছে তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। 'জগতে আমি' তাই এক অন্য অভিব্যক্তি— যা অনুভব করতে হলে আমাদের এক বিশালের মাঝে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। আমরা আমাদের মানসিক দৈন্যের কারণে দুটি বিষয়কে অবজ্ঞা করি—

প্রথমত বুদ্ধিমান প্রাণী বলে মনুষ্য প্রজাতি নিজেদের এই জগতের অধিকর্তা বলে মনে করি। জগৎ আমাদের সুখের জন্য সৃষ্টি হয়েছে— এমন মানবকেন্দ্রিক বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে পরিবেশকে, জগতকে ব্যবহার করি আমরা নিজেদের সুখের কারণে। প্রাকৃতিক সম্পদের যদৃচ্ছা ব্যবহার ক্রমশ শোষণে পরিণত হয় ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা যে প্রয়োজন তা ভুলে আত্ম-প্রেমে মগ্ন আমরা। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিকে করার যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তাও কিন্তু নিজেদের রক্ষা করার তাগিদের কারণেই। আমরা জেনেছি পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। পরিবেশ তাই উদ্দেশ্য নয়, উপায় বলেই আমাদের কাছে মূল্যবান। কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যগ্রন্থের পতিগৃহে যাত্রার সময় বনভূমির প্রতিটি বৃক্ষ, লতাগুল্ম, পশুপাখির প্রতি শকুন্তলার যে উদ্বেগ, যে মায়াময় ব্যবহারের বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করি তা কিন্তু আমাদের আধুনিকতার মানসিকতার অযৌক্তিক রোমাণ্টিক বর্ণনা বলেই মনে হয়। পরিবেশের প্রতি এমন উপেক্ষাই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষ যতক্ষণ নিজেকে প্রকৃতির অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক, উন্নত বলে মনে করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশকে শোষণ করার মনোভাব দূর হবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা এই বিশাল জগতেরই একটা অংশ মাত্র— যা অন্যান্য অংশ থেকে পৃথকও নয়, অধিক মূল্যবানও নয়।

মানব সভ্যতার আদিতে প্রকৃতির প্রতি আমাদের এক ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল। আদিম মানুষ মনে করত প্রকৃতিই মানুষকে চালনা করে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকারী মানুষ যখন অসংবেদনশীলভাবে পরিবেশকে ব্যবহার করা শুরু করলো দুঃখের সূচনা হলো তখন থেকেই। অথচ অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন কিন্তু জগৎ ও মানুষের সম্পর্ককেই স্বীকার করেছে, পরিবেশকে শ্রদ্ধা করার কথাই বলেছে। উপনিষদে বায়ু, অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রকে স্তোত্রের দ্বারা আরাধনা করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অদ্বয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সকল কিছুর স্রষ্টা হলে, অর্থাৎ জগতের সব কিছুর উৎস হলে মানুষকে কি জগতের অন্য অংশ থেকে আমরা প্রকৃত অর্থে পৃথক বলতে পারি? পুনর্জন্মের তত্ত্বে বিশ্বাসী বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জাগতিক বিষয়ের প্রতি মোহ, তৃষ্ণাকেই জন্মের কারণ বলে নির্দেশ

করেছেন। জগতের প্রতি আকর্ষণই কিন্তু আমাদের জীবনধারণের কারণ। তাই জগতের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক অনেক গভীরে। চৈতন্যের অধিকারী মানুষ নিজেকে জড় জগৎ থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করলেও স্মরণে রাখতে হবে চৈতন্য ক্রিয়া করতে পারে না যদি জড়দেহও উপস্থিত না থাকে।[১] ফলে ব্যক্তি যে কেবলমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর জন্যই জগতের উপর নির্ভরশীল তা নয়। তার জৈবিক ও মানসিক উভয় প্রকার অস্তিত্বই নির্ভর করে জগতের উপর। তার কর্মক্ষেত্র, সাধনভূমি। তার সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয় এই জগতে। তাহলে এমন জগতকে শোষণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বলা যায়, এই জগতকে, জগতের পরিবেশকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বৌদ্ধ অনুশাসনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিলাসিতা, কামনা-বাসনার পথ পরিত্যাগ করার জন্য বৌদ্ধ দর্শনের শীল অর্থাৎ সদাচার পালনের কথা বলা হয়েছে— যা সম্ভব হয় মনের শুদ্ধতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা দ্বারা। কি প্রকার বাক্য ব্যবহার, কর্মপালন, জীবিকা নির্বাচন আমাদের জন্য শ্রেয় নয় এবং কিরূপ কর্মপালন কর্তব্য, সবই বারিত্র্যশীল ও চারিত্র্যশীলের মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা ও মুদিতা— ব্রহ্মবিহারে উল্লিখিত এই সৎ আবেগগুলির চর্চাও যে অত্যন্ত জরুরি তাও বৌদ্ধ দর্শনে আলোচিত হয়েছে। জগতের পরিবেশকে কলুষিত করার কারণ তাহলে বাহ্য জগতে নয়, আমাদের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। তাই আমাদের মনের হিংসা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, মায়া ত্যাগ করা প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার দূর করা জরুরি। তবেই নিজেকে জগতে পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব হবে, জগতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা সহজ হবে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি অবজ্ঞা করার জন্য জগতের সংকট দেখা যাচ্ছে তা এবার আলোচনা করা যাক। এ প্রসঙ্গটি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই সমস্যার সংশোধন না হলে কবি জীবনানন্দের ভাষায় বলতেই হবে 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ।'[৩] যেভাবে মানবপ্রজাতি বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অহংকারের নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তেমনি নিজের সামাজিক পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের কারণের ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে। নিজেকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করার প্রবণতা আধুনিক যুগের মানুষের মধ্যে উপস্থিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকরা দাবি করতেই পারেন যে সভ্য সমাজ যখন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে, সমাজের একক বলে ব্যাখ্যা করে তখন কিন্তু সে অপর ব্যক্তিকেও সমান মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের কথা বলে। সে কারণে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণায় একটি শর্ত আরোপ করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে ব্যক্তি সেই পরিমাণ স্বাধীনতা লাভে সমর্থক যে স্বাধীনতা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির

অনুমোদনসাপেক্ষ। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সম্পর্ক এখানে স্বীকৃত হয়েছে তা Hard relationship[৫] বা অকোমল একটি সম্পর্ক যেখানে মূল উদ্দেশ্যই হলো দেহবিশিষ্ট দুটি সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা। এখানে মানবসম্পর্ক যান্ত্রিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি যেন কেবল তার প্রাপ্যটি বুঝে নিতে আগ্রহী। স্বার্থত্যাগে তার কোনও আনন্দ নেই। ব্যক্তি কেবল লাভ-লোকসানের নিক্তিতে জীবনকে পরিমাপ করে। মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন তার নিজের অধিকার সুরক্ষিত করা।

মানুষের যে স্বার্থপূরণ এবং লাভ-লোকসানের নিরিখে জীবন ও জগতকে বিচার করার প্রবণতা রয়েছে তা কিন্তু বহুকাল যাবত দার্শনিকেরা তাদের তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন উদাহরণস্বরূপ আমরা টমাস হবসের[৬] সমাজের আদিতে মানুষের মনোভাব সম্পর্কিত বক্তব্যের উল্লেখ করতে পারি এই ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ শান্তিতে সুরক্ষিত জীবনযাপন করতে সমর্থ হতো না যদি না তার একটি পারস্পরিক বিশ্বাস এর সম্বন্ধে আবদ্ধ হতো। কিন্তু এই বিশ্বাসের ভিত্তি কী? স্বার্থপর ব্যক্তিরা তাদের পারস্পরিক সুবিধা ও লাভের জন্য কিছু কিছু অধিকার পরিত্যাগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। মানবপ্রকৃতির এমন ব্যাখ্যায় আমাদের সংকীর্ণতা মনোবৃত্তির দীনতাই প্রকাশিত হয়। যদিও কেনেথ ইনাডা[৭] মনে করেছেন সমাজের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে এমন ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও এটির দুর্বলতাকেও অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যাখ্যায় মানুষকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ কেবল যেন আদান-প্রদানের সম্পর্কে আবদ্ধ, স্বার্থসিদ্ধিই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাই সংকট দূর করার উপায় হলো বক্তিতে ব্যক্তিতে কোমল সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করা। কারণ এই সম্পর্ক ব্যক্তির প্রকৃতিকে, তার স্বভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অকোমল সম্পর্কে ব্যক্তির মন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি উপেক্ষিত হয়; তার জীবনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অধিক মূল্য দেওয়াই এই কোমল ও অকোমল সম্পর্কে কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। বরং বলা যায় অকোমল সম্পর্ক কোমল সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত, যদিও বিপরীত কথাটি সত্য নয়, মানুষের মন তার প্রকৃতি প্রাধান্য লাভ করার অর্থই হল মানুষ, যা কিছু প্রভাবিত করে তা সমস্তই এই কোমল সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হবে। অকোমল সম্পর্ককে আত্মস্থকারী কোমল সম্পর্ক হল সরল, অকপট, বিস্তৃত, গভীর, নমনীয় সৃজনশীলতাবিশিষ্ট। জীবনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে পরিত্যাগ করে আমরা যদি সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের অনুভূতিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তবে মানবসম্পর্কটি কি কোমল সম্পর্ক হয়ে উঠবে। অনুভূতিকে মূল্য দিলে আচরণে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। একটি শিশু যেমন শিশুকালে সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে সংস্কারহীনভাবে জগতের সবকিছুকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়,

সামাজিক জটিলতা তাকে স্পর্শ না করার জন্য মুক্ত মনে সে নিজেকে প্রসারিত করে, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময়ও আমাদের মনোভাব এরূপ হওয়া উচিত। আমাদের মনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতাবোধকে দূর করতে হবে। কারণ এমন মানসিকতাই ব্যক্তিকে তার নিজস্ব জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য করে। অকোমল সম্পর্কেও অপরকে বঞ্চিত না করার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু কেন বঞ্চনাকে অন্যায় বলা হয়েছে? যেহেতু আমরাও অপরের থেকে সমরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সে কারণেই অপরকে বঞ্চিত না করার কথা বলা হয়েছে। কী কারণে অপরকে বঞ্চিত না করার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমস্যার জড়। আমি বঞ্চিত হতে চাই না বলেই অপরকে বঞ্চিত করা থেকে বিরত থাকবো— এমন চুক্তি দ্বারাই চালিত হওয়ার অঙ্গীকার আমাদের নিকট প্রত্যাশিত বলে মনে করা হয়েছে। এখানে পারস্পরিক দায়িত্বের প্রসঙ্গে নম্রতা, মানবিকতা, সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু এগুলিই প্রকৃতপক্ষে দুজন ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত প্রস্তুত করে বলে দার্শনিকেরা মনে করেন। একে অপরের মানসিকতা, আবেগ, অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে না পারলে, অন্যকে সম্মান জানাতে অসমর্থ হলে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে মুক্ত মনের মানুষ হতে হবে— যে অপরের সুখ-দুঃখকে অনুভব করতে পারবে। আমাদের এমন মনের অভাব বলেই আমরা এই সংকটে অপরের প্রতি করুণার কারণে দায়িত্ব পালন করলেও, তাদের দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করি না। নিজস্ব জগতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে সহমর্মিতার কথা বলছি কারণ তাকে ফ্যাশন বলে মনে করছি কিন্তু সমমর্মিতাবোধ আমাদের নেই।

অস্তিবাদী দার্শনিক সার্ত্রে মনে করেন 'ব্যক্তিবাদ' কথাটি ব্যক্তির স্বাধীনতার স্বার্থেই ব্যক্তির দায়িত্বকে নির্দেশ করে।[৮] সার্ত্রে মনে করেন ব্যক্তি নিজেই নিজেকে, তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। নিজের অস্তিত্বকে স্বইচ্ছা অনুসারে প্রতিষ্ঠা করার স্বাধীনতা মানুষের আছে— একথা প্রমাণ করতে সার্ত্রে[৯] ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন। এই স্বাধীনতার সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত মানুষের দায়িত্বের প্রসঙ্গ। মানুষ স্বাধীন বলে সে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। এই দায়িত্ববোধের কারণে সে মানবিক বোধকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই সার্ত্রে মনে করেন, আমাদের আদর্শ ও কর্মের নির্বাচন কখনো ব্যক্তিসাপেক্ষ হবে না, অন্য সাপেক্ষ হবে। কারণ ব্যক্তি কোনো কর্ম অথবা তার আদর্শ নির্ধারণ করার সময় সকলের জন্য নির্বাচন করে। কারণ সে নিজেকে আদর্শ ব্যক্তি বলে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়। আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা একটা মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাই ব্যক্তির কৃতকর্ম যদি অপরের নিকট মঙ্গলজনক বলে প্রতিপন্ন না হয় তবে তা ব্যক্তির জন্য ভালো বলে গণ্য হবে না, যেহেতু ওই কর্মের দ্বারা কোন মূল্য সৃষ্টিতে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে। তাই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কর্ম কখনোও ভালো বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। সার্ত্রে মনে করেন, মানুষ তাদের

নির্বাচন প্রসঙ্গে একটা উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ অনুভব করে। অপরের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে সে এই উদ্বেগ অনুভব করে কারণ ব্যক্তি জানে যে তার সিদ্ধান্ত তার একার নয় সকলের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে তাই সে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা সকলের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু সার্ত্রের এমন ব্যাখ্যা বর্তমান যুগের ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতার ভাবনায় তাড়িত মানুষের পক্ষে অনুধাবন করাই কঠিন হয়। আমরা অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ উপলব্ধিতেই অসমর্থ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ, তাদের জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নয়, ঐহিক সুখের সন্ধানেই তারা ব্যস্ত। মানব সম্পর্ককে তাই তারা অকোমল সম্পর্ক বলে মনে করে— যেখানে অপর ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ সাহায্য করাই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয় যতটুকু সুবিধা ওই ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার জগৎ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা নিজেকে অপরের সাথে যুক্ত করতে না পারি। ব্যক্তির অস্তিত্ব যে অন্যব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে না তার প্রমাণস্বরূপ দার্শনিকেরা প্রজনন ভাষা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] আমরা অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজের সামর্থ্য অনুসারে সম্পন্ন করতে পারলেও সন্তান উৎপাদনের জন্য এবং ভাষা ব্যবহারের জন্য অপর ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে নিজের জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকলে জীবনযাপনই অসম্ভব হয়ে থাকে।

আস্তিক মানবতাবাদী দার্শনিক মার্টিন বুবার মনে করেন, এক ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিন্তু অপর ব্যক্তির অস্তিত্বই সূচিত করে। 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করার অর্থই হলো 'তুমি'র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া।[১১] 'আমি' শব্দের ব্যবহার করে আমরা নিজেদের অপরের থেকে পৃথক করার সঙ্গেই অপরের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। এভাবেই তিনি মনে করেন সকলের অস্তিত্বই সম্প্রদায়-নির্ভর। বুবার তার অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যায় দু'প্রকার— সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। একটি হলো I-Thou বা আমি তুমি সম্পর্ক। অপরি হল I-It বা আমি এটির সম্পর্ক। 'I', 'Thou', বা 'আমি', 'তুমি'— এই শব্দগুলি হলো কতগুলি মৌলিক শব্দ যাদের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে। কেবলমাত্র Logical operator বা যৌক্তিক ধ্রুবক এগুলো নয়। বুবার মনে করেন যে মৌলিক শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র বক্তা তার দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে, তার অস্তিত্বের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে। এই সম্পর্ক দুটির প্রকৃতির ভিন্নতা অনুধাবন করা সহজ হবে যদি ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে মার্কিন হাইডেগার উল্লিখিত শব্দদুটোর কথা বলি। হাইডেগার Concern বা আগ্রহ এবং Solicitude বা উদ্বেগ শব্দ দুটির উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য এই শব্দ দুটির সাধারণ অর্থ এখানে গ্রহণ করা হয়নি। জন ম্যাককুমারির [১২] মতে, বুবারের আমি-তুমি সম্পর্কটি আমার Solicitude শব্দের দ্বারা বুঝতে পারি। কারণ এখানে ব্যক্তিদ্বয় একে অপরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কিত হয়। কারণ এমন ক্ষেত্রে আমরা মুক্ত মনে মনে অপরকে গ্রহণ করি। অপর ব্যক্তি এখানে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়

নয়। তার সাথে আমি মানসিক সম্পর্কে আবদ্ধ। এই সম্পর্কে একের অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে, আগ্রহ রয়েছে, উদ্বেগ রয়েছে, অপরের জন্য অনুভূতি রয়েছে।

কিন্তু ম্যাককুমারি মনে করেন, হাইডেগারের Concern শব্দটি বুবারের I-It সম্পর্ককে বোঝায়— যেখানে আমরা প্রয়োজনে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। এ সম্পর্ক আংশিক ও বাহ্যিক, যেহেতু এ সম্পর্ক প্রয়োজনে স্থাপিত। প্রয়োজন পূরণেই এ সম্পর্কের অন্ত। এমন সম্পর্কে অনুভূতির কোনো স্থান নেই। একে অপরের প্রতি এক্ষেত্রে কোনো উদ্বেগ অনুভব করে না। বাবুর মনে করেন, প্রকৃত সম্পর্কের ভিত্তি হবে dialogue বা মত বিনিময়। প্রকৃত সম্পর্ক কখনো একপাক্ষিক আধিপত্যমূলক, আগ্রাসী প্রকৃতির হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে মুক্তমনে অপরে বক্তব্য শোনা ও অনুভব করার মানসিকতা থাকতে হবে। অর্থাৎ অপরকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির মর্যাদা দিতে হবে। এমন সম্পর্কে ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে কোন আড়াল নেই। তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও তাদের সম্পর্ক হবে মানবিকতার সম্পর্ক— যাকে এই বাহ্য বিষয়ের মলিনতা স্পর্শ করবে না। সামাজিক অর্থনৈতিক দূরত্ব সম্পর্ককে প্রভাবিত করলে মত বিনিময় সম্ভব হবে না।

এখানে বুবার একটি বিষয়ে সচেতন করেছেন। তিনি যেহেতু মত বিনিময়ের পথ খোলা রেখেছেন তাই distance বা দূরত্বকেও এই সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ সম্পর্ক মিলন বা ঐক্যের সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনযাপনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সে জন্যই দূরত্বের কথাও প্রাসঙ্গিক। দূরত্ব আছে বলেই দুজন ব্যক্তি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, নিজ নিজ অনন্যতাকে প্রমাণ করতে পারবে। এ সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়, অপরকে নিজ ইচ্ছা অনুসারে চালনা করা নয়। অপরকে জানা-বোঝার সম্পর্ক, অপরের অস্তিত্বকে অনুমোদনের সম্পর্ক। একে সখ্যতার— ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলা যাবে না যেখানে দুজনকে পৃথক করা যাবে না। পারস্পরিক সম্পর্কের দুঃখজনক দিক হলো আমি-তুমি সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই আমি-এটির সম্পর্কে পরিণত হয়ে যায়। আমরা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য তৃপ্তির কারণে ব্যবহার করি এবং নিজের জীবনে তাকে মূল্য দিতে অস্বীকার করি। যখন অপর ব্যক্তি আমার ব্যক্তি জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে না তখনই শোষণ, বৈষম্যের সূত্রপাত হয়।

আমি-তুমির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অনেক সংকটের মোকাবিলা সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হবে। ব্যক্তিগত জগতের গণ্ডিকে বিস্তৃত করে অপরকে যদি জানার, বোঝার চেষ্টা করা হয়, অপরের অনুভূতির ভাগীদার হওয়া যায় তবে বর্তমান সংকটের সমাধান সহজ হবে।

সূত্রনির্দেশ

১। দি লাইফ ডিভাইন, ১৯৪০
২। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, ১৯৮৪
৩। জীবনানন্দ, ১৯৫৪
৪। অন লিবার্টি ১৯৯১
৫। এক্সিসটেনশিয়ালিস্‌ম্‌ ১৯৭২
৬। প্রিন্সিপিলস অব সোশাল এন্ড পলিটিকাল থিওরি ১৯৭৬
৭। কনটেমপোরারি বুদ্ধিষ্ট এথিক্স, ২০০০
৮। জাঁ পল সার্ত্রর অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ, ১৯৯১
৯। এক্সিসটেনশিয়ালিস্‌ম্‌ ১৯৭৯
১০। এক্সিসটেনশিয়ালিস্‌ম্‌ ১৯৭২
১১। এক্সিসটেনশিয়ালিস্‌ম্‌
১২। এক্সিসটেনশিয়ালিস্‌ম্‌

গ্রন্থপঞ্জি

কেওনদামি এন সম্পাদিত, কনটেমপোরারি বুদ্ধিস্ট এথিক্স, কার্জনপ্রেস, রিচমন্ড, সুর্য়ে ২০০০
দাশ, জীবননানন্দ, বেলাঅবেলা কাব্যগ্রন্থ, ডায়নামিক প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১৫১
ভদ্র, মৃণালকান্তি, জাঁপল সার্ত্রের অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯১
মিল, জনস্টুয়ার্ট, অনলিবার্টি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯১
মেরীওয়ার্নক, এক্সিসটেনশিয়ালস্‌ম্‌, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৭৯
ম্যাককুয়ারি, জন, এক্সিসটেনশিয়ালস্‌ম্‌, পেঙ্গুইনবুকস্‌, ই.উ.কে, ১৯৭২
বারকের, আর্নেস্ট, প্রিন্সিপলস অব সোসাল এন্ড পলিটিক থিওরি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৭৬
শ্রী অরবিন্দু, দ্যলাইফ ডিভাইন, শ্রীঅরবিন্দআশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৪০
স্বামীবিদ্যারণ্য, বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪

প্রবন্ধটি, ৮/৬/২০২০, বাসন্তীদেবী কলেজ, IQAC এবং মূরলীধর গার্লস কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ।